স্বরচিত আত্মার পরিত্রাণ

"আমি deliberately suicide করতেই বসেছিলুম—জীবনে আমার লেশমাত্র তৃপ্তি ছিল না। যা কিছু স্পর্শ করছিলুম সমস্তই যেন ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলছিলুম। এ রকম এক উল্টো মানুষ যে কি রকম হতে পারে এ আমার একটা নতুন experience—সমস্তই একেবারে দুঃস্বপ্নের ঘনজাল।"

রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র, ২য় খণ্ড

একবার মৃদু সন্ধ্যার আশ্রয়ে টেলিভিশন প্রায়শ নির্মাণ করছিল আমাদের জন্য হলোকাস্ট, গাজা-ভূখণ্ড এবং আগুন-মৃত্যুর স্মৃতি: গাজায় ঘণ্টা-প্রতি শিশুমৃত্যুর সংখ্যা চার এবং জগৎ-সংসারে প্রতি চল্লিশ সেকেন্ডে আত্মহননের সংখ্যা এক—যখন হয়তো ইফতারের আয়োজনও চলছিল, আমাদের এই রাস্তার অলিগলিতে কোথাও: আজ ছুটির দিনে তৈরি করতে পারেন মজাদার চিকেন কিমা কাটলেট। ইফতারের এই আইটেম মন কাড়বে সবার; রোজার পরেও বিকেলের নাশতায় চায়ের সাথে বা বাচ্চার টিফিনে দিতে পারেন মজাদার চিকেন কাটলেট।

রবীন্দ্রসংগীতের মতো শক্তিমান ঔষধির সঙ্গে বসবাসের পরেও আমরা যারা তাকে ধীর পায়ে হেঁটে যেতে দেখতাম, জেনেছিলাম একাত্তরে তার হাতে তৈরি পতাকা উড়িয়েছিলেন তার গুলিবিদ্ধ

পিতা, জেনেছিলাম তিনি প্রকৌশল বিদ্যাবিমুখ এবং অভিমুখ তৈরি করেছিলেন রবীন্দ্রসংগীতে—তিনি অকস্মাৎ স্বেচ্ছামৃত্যুতে জড়িয়ে যান প্রথম রমজানে, যখন অলিগলিতে টেলিভিশনে রূপান্তরিত গাজা-ইউক্রেনের বিপুল আগুন-মৃত্যুর ধোঁয়া এবং যুগপৎ অপরূপ চিকেন কাটলেটের সৌরভ। আমাদের অনুমান এই-প্রকার মৃত্যু নির্মাণ হয় খুব নিভৃতে, নাকি মরব না জেনেও তবু আমি মরে যাচ্ছি—এই ভাবনাটি আমাদের ছেয়ে ফেলে দ্রুত? হাওয়া আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে—এ রকম ধারণা হয় কখনো। মাংসের কিমা, আদা বাটা, রসুন বাটা, কাঁচামরিচ বাটা, সাদা মরিচ, টমেটো সস, ব্রেড ক্রাম... ক্রমশ প্রগাঢ় গাম্ভীর্যে সোনালি হয়ে উঠছে কড়াইয়ের তেলে; অথবা মেধাবী কাটলেটের তেল শুষে নিচ্ছে কিচেন টিস্যু; যখন কেবলই ভাবনায় আসে—মরব না জেনেও তবুও আমি মরে যাচ্ছি যেন..., নাকি হাওয়া আমাদের দ্রুত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে? ধেয়ে আসা অন্ধকারের আস্ফালন এবং গাছের সঙ্গে হাওয়ার অভিসার আমাদের রাতকে করে ক্ষুদ্রতর। আমরা নিজেদের হতাশায় নেশাগ্রস্ত হই, আঁধারের গর্জন শুনি—হয়তো জানালার ওপারে রাত কাঁপে, চাঁদ ছটফট করে, মেঘ টলোমলো হয়, ঝরনার জলে স্নান করব বলে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়াই। কাশির শব্দ আসে। কি একা থাকে আমাদের বাড়ির ছাদবাগান, খুব একা আমাদের বাড়ির ছাদবাগানটা; যে অচেনা মেঘ বৃষ্টি আনবে তার প্রত্যাশায় আমাদের বাড়ির বাগানটা হাই তোলে সারাক্ষণ। দূরের ঝিলটা ফাঁকা, শস্য-শ্যামল জনপদ থেকে ভেসে আসা অনভিজ্ঞ দু-একজন স্ট্রিটগার্ল; বাগানটা মরে যাচ্ছে, কেউ ভাবতে চায় না, কেউ গাছ-বৃক্ষের কথা ভাবছে না, ফুলেদের কথাও ভাবছে না, ঘরে আটক মাছেদের কথাও নয়। কেউ ভাবতে চায় না, বাগানটা মরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। ধীরে ধীরে সবুজ স্মৃতি অভ্যন্তরী-আগুনে দেশান্তরী হচ্ছে,... আর কাশির শব্দ আসছে রাস্তা থেকে... কি একা থাকে আমাদের বাড়ির বাগান।... হায়! এই

আমার ক্ষুদ্র রাত। আমার এই ক্ষুদ্র রাতে ধ্বংসের ভয়,... কে জানে, হয়তো হাওয়া আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে একদিন, অবগুণ্ঠিত পবিত্রতা ও লৌকিকতা নামক এক অদৃশ্য কারাগারে।

হায়! এই আমার ক্ষুদ্র রাত।... জামে মসজিদসংলগ্ন কবরস্থানে লোকটি শায়িত হওয়ার পর আমরা শহরজুড়ে, টেলিভিশনজুড়ে এই প্রকার কেচ্ছা-কাহিনি সঞ্চয় করতে থাকি, আমাদের সফল কাটলেট-নির্মাণের সৌরভে। লোকটি কি কখনো বলেছিল—জীবনদীপের মতো বাড়াও তোমার অনুগত ঠোঁট আমার আলিঙ্গনের মাঝে; আমি সত্যিই তোমাকে চাই, তবু তোমার নিজের হাতে জড়িয়ে ধরতে পারব না; পারছি না। সদ্য বন্ধ হওয়া অথবা ভেঙে ফেলা জানালার ওপাশে কেউ তোমাকে, আমাকে খুঁজতে বসে। জানালার ওপাশে রাত কাঁপে, আর ঘরের ভেতর নির্মীয়মাণ রবীন্দ্র-আখ্যানে আমাদের চেনা পৃথিবীর ঘূর্ণনগতি সীমিত করে; এসব কথা কবে বড়ো ঠাকুর বলেছিলেন?—'বিষণ্নতা, সঙ্গে অস্থিরতা ও মরণেচ্ছা—ক্রন্দনের অপ্রতিরোধ্য তাড়না। সর্বত্রই কেবল বাধাবিপত্তি দেখতে পায়। আশাহীন, আত্মহত্যাপ্রবণ, মরিয়া; প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণা। বিবেকপরায়ণতা নিয়ে অত্যধিক দুশ্চিন্তা; নিজের ও অন্যদের সম্বন্ধে হতাশা। খুঁতখুঁতে, ঝগড়াটে মেজাজ। একবার খিটখিটে ভাব, একবার প্রফুল্লতা।' গলায় মৃত-সুর কাঁপে—ফিরিয়ে নে মা, ফিরিয়ে নে গো—সব যে কোথায় হারিয়েছে গো/ছড়ানো এই জীবন, তোমার আঁধার-মাঝে হোক না জড়ো।...

টেলিভিশনজুড়ে মৃত্যু-সভার আনন্দ-গান—জিজ্ঞেস করি—তুমি লিখছ কার জন্য? মৃতদের জন্য, যাদের তুমি একসময় ভালোবেসেছ? তারা কি আমাকে পড়বে? না।... এজন্য সব কথা আমরা বলছি না।... আপনি হলোকাস্টের ওয়েবসাইটেও যেতে পারেন অবসরে। টেলিভিশন ডার্ক ট্যুরিজমের নেমন্তন্ন দেয়—এই মানুষগুলো অপেক্ষা করছে মৃত্যু-অমৃতের জন্য। এই ছবিতে, তারা থেঁতলে যাওয়া শরীর,

মস্তক এবং পুড়ে যাওয়া চর্মবিশেষ। পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তেই এই ছবি অনর্গল নির্মীয়মাণ—ধন্দে পড়ি আমরা: চামড়ার নিচে মাথার খুলি, নাকি হারিয়ে যাওয়া খুলির চামড়া—কোনটি বেশি ভয়ংকর? খেয়াল করুন—

এখানে শুধু একজন বেঁচে আছে। এই ছবিতে লাশ পুড়ছে। সাথে রাত এবং কুয়াশা। ভয়ে লোকটি কবরের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ে, যখন তার শরীর ছিল জীবিত। তারপর তার শরীর-মাথা-ধড় সামরিক-নৈপুণ্যে মাটির গভীরে লীন হওয়ার বাধ্যতামূলক সাধনাযজ্ঞে লিপ্ত হয়। এই ছবিতে তাদের পোড়া মাংসের আঁশ লেপ্টে থাকা আইডি কার্ডের বৌদ্ধিক স্তূপ। একটি ট্রাক্টর লাশ পরিষ্কার করছে রাস্তা থেকে।... ছবির ভেতর কাহিনি ভাসে—বালক কথা বলে: এই ফটোগ্রাফ দেখার আগে এবং দেখার পরে—আমি দুই অংশে বিভক্ত হলাম। শুধুই ফটোগ্রাফ—যার সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিল অগভীর ও সামান্য; এখন ফটো দেখার পর, আমার কিয়দাংশ ভেঙে পড়ে। বাবার ড্রয়ার খুঁজতে শুরু করি; বহুকাল আগে বাবার কাছে লুকিয়ে রাখার জন্য চেনা-অচেনা মৃতমানুষের এই ছবিগুলো পৌঁছায় তার বন্ধুর হাত হয়ে। কখনো আমি নিবিড়ভাবে মৃতদেহ দেখিনি। শত শত মৃতদেহ গাছের গুঁড়ির মতো ওপর-নিচ করা। কেউ উলঙ্গ, কেউ সামান্য কাপড় জড়িয়ে। একজন সামান্য হাসি ছড়িয়ে—টেলিভিশন কোনো এক প্রাচীন পৃথিবীর জেনোসাইড বিষয়ে গল্প বলে: মৃত্যুর সেই রাতে প্রথমে আমরা হাঁটি, তারপর ট্রেনে। তারা আমাদের শিশুদের ছিনিয়ে নিচ্ছিল। আমি আমার শিশুকে চাদরে জড়িয়ে একটি পুঁটলি তৈরি করে বাম বগলে আটকে রাখি। কিন্তু শিশুর কান্নায় বাধ্য হয়ে আমি এই সযত্নে রাখা পুঁটলিটি ক্যাম্পের কম্যান্ডেন্ট বরাবর হস্তান্তর করি। তারপর আমরা এই জায়গায় পৌঁছাই। আমার প্রতিবেশিনী জিজ্ঞেস করে—তোমার শিশু কই? আমি বলি—কীসের শিশু? শিশু নামক পুঁটলিটি কম্যান্ডেন্ট

বরাবর নিরুপায়-হস্তান্তরের পরে আমি নিশ্চিত হই—এই জগতে আমার কোনো শিশু নেই, আমি কোনো শিশুর খবর জানি না।

অনুমান হয়, টেলিভিশনের এই মসৃণ-মনোহর প্রকৌশল আমাদের মহল্লার ওই লোকটির ভেতরেও মৃত্যুর ক্ষুধা, মৃত্যুর শাখা-প্রশাখা, সৌরভ, মরশুম এবং জ্যোতির্বলয় ছড়ায় গুপ্ত-ঘাতকের মতো। ভেতর থেকে বন্ধ-দরজা ভেঙে ফেলার পর সচল-সরব টেলিভিশনের এই সব অনন্ত-বেগবান টেলি-সাফারিং রিমোটের কল্যাণে দ্রুত স্তিমিত করে এবার লোকটিকে আমরা ঈষৎ শীর্ণকায় *গীতবিতানের* পাশে—বিছানায় শায়িত করি, হাসপাতালে নিই এবং জামে মসজিদসংলগ্ন কবরস্থানে শায়িত করি, রবীন্দ্র-মুগ্ধ বিপুল শবানুগামীর সহযোগিতায়। মাটির প্রথম চাঁই কবরে ভেঙে পড়ার শব্দ আমাদের হতচকিত করে, আমরা হৃদকম্প শুনি এবং আমাদের ঠোঁট থেকে, চোখ থেকে যে অক্ষর নামে—তা হয় জলজ, নগ্ন, স্বচ্ছ এবং মনমরাদের মেঘ। যন্ত্রণার প্রথম ঝলকের মতো শব্দগুলো হয় নিয়ন্ত্রিত, শ্রান্ত ও কথাবলা জট—এই প্রথম রবীন্দ্র-মগ্ন কোনো মানুষ এই শহরে স্বেচ্ছামৃত্যু আহ্বান করল। লোকেদের বিপুল প্রশ্ন—একজন রবীন্দ্র-দ্রবীভূত মানুষ স্বেচ্ছামৃত্যুতে যায় কেন? এই প্রকার অনুসন্ধানে লোকেরা গুজব, রটনা ও বয়ান সঞ্চয় করে জিভে, লালায় এবং শ্বাসাঘাতে। লোকেরা নিয়ন্ত্রিত হয়। লোকেরা স্বপ্ন-স্বপ্ন চোখে বর্ণমালা পড়ে। লোকেদের ছায়া পড়ে ইটের দেওয়ালে। লোকেরা অপলক হয় এবং অব্যক্ত বয়ানে বিবিধ বিতর্ক-বিদ্যা নির্মাণের প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভুক্ত হয়—স্বেচ্ছামৃত্যু কি ক্রাইম? পেনালকোড ৩০৯ ধারায়—আত্মহনন-আকাঙ্ক্ষী মানুষ আইন অনুসারে শাস্তিযোগ্য—০১ বছরের কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয়। আত্মহনন ১৮০° স্বেচ্ছা-খুন। আত্মহনন নিজের বিরুদ্ধে একটি অপরাধ, বিচ্ছিন্নতার শেষ শব্দ; অথবা আমি ধীরে ধীরে একদিন প্রতিশোধপরায়ণ হয়েছিলাম, খুনি হতে চেয়েছিলাম, অপরাধী

ছিলাম, পাপী ছিলাম, আটকে যাওয়া মানুষ ছিলাম, অথবা আই ওয়াজ হোপিং রি বার্থ... আমি ক্ষমাপ্রার্থী, আবার বাঁচতেই চেয়েছিলাম হয়তো-বা।

আমাদের কেউ এই বিতর্ক বিদ্যায় যুক্ত করে তাঁর ফুপুর একদা সুইসাইড নোটস্, দুই কন্যার উদ্দেশে লিখা... তোমরা দুজন ছিলে আমার সবচেয়ে বিস্ময়কর সম্পদ। আমার এই কাজকে ক্ষমা করো। তোমাদের বাবা তোমাদের জন্য ভালোই হবে। কিছুদিনের জন্য কষ্টকর হবে, কিন্তু পরবর্তীকালে সহজ হবে। আমাদের ভালো সময়গুলো মনে রেখো। সামান্য একটু স্বর্ণ আছে—দুই বোন ভাগ করে নিয়ো। তোমাদের আমি ভালোবাসি—কিন্তু ভবিষ্যতের মুখোমুখি হতে পারব না বলে বিদায় চাইছি।... ক্রমে-ক্রমে লোকেদের ধারণা হয়—আত্মহনন একপ্রকার সমাধান, আত্মহননে তোমার সজাগ মন স্থির হয়, আত্মহননের বড়ো উদ্দীপক মনোজাগতিক ব্যথা; বড়ো কারণঃ হতাশা-অসহায়ত্ব এবং আশাহীনতা, কখনো চিন্তার দ্বৈততা, জীবনের আবদ্ধতা; অথবা জীবন থেকে নির্গমন এবং ইচ্ছার সংযোগ সাধন। আমাদের তাজমহল রোডের সি-১২/১০ গৃহে সদ্য নির্মিত স্বেচ্ছামৃত্যু, আমাদের রাস্তাঘাট এই সব টিকাভাষ্যে অনেক দিন বিরান করে রাখে। রবীন্দ্র-অধিকৃত মানুষ কেন ধাবিত হলেন ইচ্ছামৃত্যু নামক ব্রতকর্মে! আমরা ধীরে-ধীরে নিশ্চিত হই—এই বই তাকে উদ্দেশ্য করে নয়, আর চিরনিদ্রাভিভূত-পরিমণ্ডল থেকে তিনি নিশ্চয় আমাদের বাক্য-শব্দ পাঠ করবেন না কখনো। আসলে তার অস্তিত্ব কীভাবে আমাদের জীবনকে স্পর্শ করেছে—এই লেখা তার সামান্য ভাবানুবাদ। কতদিন ভেবেছি—মানুষ কি তবে স্মৃতির সঞ্চয়, নাকি সে নির্মাণ করে চলে 'আশাতীত ফুল' নামক ভবিষ্যৎ। হয়তো সংযোজন-বিয়োজনের এক জটিল অঙ্কে আমরা শেষ পর্যন্ত ঘরেই ফিরি,... হোম কামিং...। কবে একবার মেঘ দেখে, ভেবেছিলাম—

কোদালে কোপানো মেঘ। আমাদের কেউ নদীতে পা ডুবিয়ে রবিঠাকুরের গান করে, কেউ গান করে শাল এবং পলাশের বিস্তর অরণ্যে। আমাদের শহরে একটি মহল্লার নাম ছিল ডাবপট্টি, আর একটি ছিল জিলাপির গলি। কবিতার একটি লাইন কেটে লিখি—আমার ব্যক্তিগত বসন্তের চটি হারিয়েছে বাদামপাহাড়ে। ভ্যানগগ-অন্ত নির্মলদা শেখাতেন—দেখো ওঁর ছবিতে তুমি একপ্রকার গন্ধ পাবে; মৃত্যু ও বিষণ্ণতার। ছবি তুমি দেখছ চোখে না মস্তিষ্কে—কিন্তু প্রস্তুত হচ্ছে ঘ্রাণযন্ত্র। কোনো ট্যুর অপারেটর কি সুইসাইড ট্যুরিজমের ভিসা প্রসেস করে, তুমি জানো? তোমরা কি ইউথেনিসিয়া নিয়ে লড়াই করছ? তা হলে স্বেচ্ছামৃত্যু কি তোমার-আমার স্বাভাবিক উত্তরাধিকার। আমি জানি না। তবে একদিন তারা-ভরা আকাশ দেখে আমি ভয় পাই। তারার ফুল ফুটেছে। প্রতিটি মানুষই কি ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও তারা হয়ে ঝুলে থাকে মৃত্যুর পর? 'বিপন্ন বিস্ময়' কথাটির মানে তুমি কী বলবে? আপনি তো বিজ্ঞানের ছাত্র, আপনিই তো একদিন শোনালেন—তারারাও আত্মহত্যা করে; কিছু তারা অভিকর্ষের টানে ঢুকে যায় কৃষ্ণগহ্বরে,... এইটিই কি আত্মহত্যার মুহূর্ত। 'বিপন্ন বিস্ময়' শব্দটা কে শেখালেন তোমাকে? আমি নিজেও কখনো তাঁকে খুঁজতে গেছি। হয়তো তুমি যতক্ষণ বেঁচে থাকো, ততক্ষণ কিছুই হয় না; তারপর আমার মৃত্যু হয় এবং সামান্য সময়ের জন্য তোমার অনুপস্থিতি গণনা হয় ঘণ্টা এবং দিনে। হয়তো কোনো এক হেমন্তের দিনে মানুষ কাঠবাদামের ছায়ায় দাঁড়ায়, আর গাছের গা থেকে খসে পড়ে কেবল হলুদ পাতা। তুমি কি এমন একটি বেতার নাটক শুনেছিলে?

কখনো তুমি বা আমরা জেনেছি বরফের কোনো স্মৃতি নেই,... কথাটি সত্য, না ছোটো মিথ্যা! বরফের ছুরি দিয়ে হত্যা করা যায়, নিজেকেও হত করা যায়—এই প্রকার খুনের কোনো চিহ্ন থাকে না। কিন্তু জলের তো স্মৃতি থাকে; বরফখণ্ড জল হয়ে, তরল হত্যাচিহ্ন

হয়ে ঘুরে বেড়ায় নিশ্চিন্তে। মাঝে মাঝে কী হয়, কিছু শব্দ-বাক্য নাছোড় করে রাখে—যেমন হননকারী ব্যক্তি আর মৃত ব্যক্তি, কেউই আত্মার স্বরূপ জানে না। সংগীত ভবনে 'উপনিষদ' ব্যাখ্যায় কেউ কি বলেছিলেন—এই আত্মা হননও করে না, হত্যাও করে না...! ... তবে আত্মার স্বরূপ জানলেই কি মানুষ প্রকাশ করে তার আত্মহননেচ্ছা। দ্বিতীয় শব্দটি জীবনানন্দের—'বায়ু কুকুর'...! 'হেমন্তের নদীর পাড়ে' কবিতায়। বলা যায়—বায়ুকুকুরের মতো তাড়া করে আমাদের মৃত্যু, আমাদের বিপন্ন বিস্ময় এবং নিঃশেষ করার অমোঘ-আমোদ।

এই সব কথা ভেবে, আমরা আমাদের শীতকাল, মায়ের স্পর্শ-গন্ধী মাফলার গলায় জড়াই কখনো। এই ঘটনার আগে সময়কে আমি খুব ভিন্নভাবে অর্থাৎ পুরো দেহ দিয়ে মাপজোখ করতে শিখি—পুরো একটি দিন যেন একটি বছর। রাত হলো শীতকাল, দুপুর গ্রীষ্মকাল, সকাল শরৎ আর সন্ধ্যা বসন্ত। সময়যানে ভেসে যেতে-যেতে, একদিন এক সুড়ঙ্গপথে গাড়ি যাওয়ার মুহূর্তে মনে হলো—এটি কি আমার গল্প? অন্তত ১৪০ বছর আগে, যিনি বউদি থেকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে হলেন নতুন বৌঠান—তিনিই আবার নিঃশব্দে আফিম সঞ্চয় করে নির্মাণ করলেন ১৮৪০-এর ১৯ এপ্রিল; শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে গেলেন ২০/২১-এর সকালে। করোনার্স কোর্টও ঠাকুরবাড়িতেই হলো! আর সব তথ্য-উপাত্ত চিরকালের বিপন্ন বিস্ময় হয়ে বায়ুকুকুর হয় মহর্ষির মাত্র ৫২ টাকা ১২ আনার বিনিময়ে! ঠাকুরবাড়ির ছাদে খ্যাতিমান দেবরের সঙ্গে লতাপাতা, পক্ষী, নক্ষত্র, পদ্য, নাটক ও সংগীত নিয়ে বলতে-বলতেই তিনি নিঃসাড় হয়ে যাচ্ছেন ক্রমশ। মহর্ষির সিল্কের পাঞ্জাবির পকেট থেকে ডাক্তার-ওষুধের খরচ ঝরে পড়ার কালে—হয়তো তখন এপ্রিলের ২০/২১; তেতলার পরিত্যক্ত ঘরে কাদম্বরী, দেড় টাকায় প্রস্তুত আলোর ভেতর শায়িত হলেন, যেন প্রাণের আলো-বায়ু ক্রমশ

জোড়াসাঁকোকে পরিত্যাগ করে। অনুমান হয়, তখন চারপাশে মায়াময় অস্থিরতা। জনহীন সঙ্কীর্ণ গিরিখাতের ভেতর বিস্তর ধুলা ওড়ার শব্দ; আর মানুষের মুখ এবং তার গৃহজুড়ে উদাসীনতার যন্ত্রণাক্লিষ্ট সুবাস। এটি কি শেষমেশ, তবে আমারই গল্প হয়ে ওঠে?—... অনেক দিন পর, অথবা আগামীকালের সংবাদ নির্মাণের আগে আমাদের এমন একটি চুক্তিপত্র হয়—আমি আর সিলভিয়া মিলে, মাছ আড়তের পাশে বাসা ভাড়া নিয়ে আছি; আশপাশে অনেক বরফকল। আমরা প্রস্তুত আছি, আমাদের সম্পর্কের কখনো পচন এলে সস্তা বরফ কিনে পচন ঠেকাব। তারপর আমি আর কিছু ভাবিনি। আমি তাকে দেখার জন্য মরিয়া হলাম, পর পর দুটি নাম দিলাম—সন্ধ্যাস্বপনবিহারী, আর অসীমগগনবিহারী,... আর তখনই মনে হলো, যেন দেখা না হলে এই প্লেনেই সে ক্র্যাশ করবে। তার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ আমার হয়নি। সে কি কফি চেয়েছিল? টেলিভিশনে নির্মীয়মাণ গল্প-কবিতার ভেতর যুদ্ধের নন্দনতত্ত্ব ভেসে যায়, যেনবা যুদ্ধের আগের দিন সন্ধ্যায় ফোন এলো—আমি ভয় পেলাম, কান্না করলাম,... কোনোভাবেই চিনতে পারছিলাম না। পুরো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জর্মন শহর যত-না বোমা চাক্ষুষ করে, তার চেয়ে অধিক বোমা নিপতিত হয়েছে ইরাকে—এই সংবাদ পরিক্রমা শুনতে-শুনতে কেমিক্যাল-ওয়ারফেয়ারের ভয় ছুটে যায় স্ক্রিনজুড়ে। যুদ্ধের আতশবাজি হয় খেলা অথবা অতীব তরল ঘটনা—সাঁজোয়া বাহিনীর সাজসজ্জা এড়িয়ে আমরা আইরিশ কফি এবং রেড আই কফির তফাত শিখি; অথবা ইসরায়েলি দূতাবাসের সামনে ইউএন এয়ারফোর্সের অ্যারন বুসনেলের স্বেচ্ছাদাহ দেখতে-দেখতে আর্তচিৎকার শুনি—ফ্রি প্যালেস্টাইন। একবার ভাবি, এখানেই শেষ করি—কিন্তু জগতের কিছুই যে এই টেক্সটকে স্পর্শ করবে না, ভেবে স্থির হই। যেহেতু কেউ পাঠ করবে না, আমি লিখতে শুরু করি যত্রতত্র—পুরানো খবরের কাগজের মার্জিন, হোমওয়ার্কের শেষ পৃষ্ঠা

অথবা ভাউচার-রসিদের পেছন পৃষ্ঠায়। এটি কি আত্মজীবনী? লেখায় কী হয়? আমি খোলা পৃষ্ঠার দিকে তাকাই—এক প্রকারের লজ্জা, গ্লানি...। লিখে যাওয়ার অর্থ—কালক্ষেপণ, অর্থাৎ অপরকে আহত করার উপায়কে, লেখা ধারাবাহিক রাখার অজুহাতে আরও খানিকটা স্থগিত করা। একদিন কফি নেওয়ার সময় আমার সহকর্মী বলল, এক বয়স্ক বিবাহিত রমণীর সঙ্গে তার ছিল দীর্ঘমেয়াদি যৌনসম্পর্ক। নিউ ডায়মন্ড সার্কাস পার্টির বেড়াল-প্রশিক্ষকের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের কথাও সে জানাল। এখন এপ্রিল, জুলাই নাকি শীতের পূর্বাভাস। সে বলল, এই দালানের ১৬তম তলায় সে গোপনে একবার অ্যাবরশন করিয়েছিল। কিছুই না ভেবে সে *আনা কারেনিনা* উপন্যাসের প্রথম বাক্যটি পড়ে, আবার বন্ধ করে। সে অথবা আমি সেমিনারে দিল্লি যাই, একটি লেটার বক্স খুঁজি, দিল্লি গেট ছুঁয়ে দাঁড়াই—শিশির ভেজা ইটে আঙুলে অক্ষর লিখি 'এ'—যেন প্রমাণ হলো, বহুদিন আগে আমি একবার এসেছিলাম। কখনো লিখি—গত ফেব্রুয়ারির পর, আমি ওই লোকটির জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া কিছুই করিনি। যখন আমি লিখতে শুরু করলাম, তখন ওই বয়সি প্যাশন নিয়েই সব করি—সিনেমার টিকিট-কাটাসহ আমার ওয়ালেট কেনা, ... সব।

তাজমহল রোডের ইচ্ছামৃত্যু-উদযাপনকারী ওই লোকটির সঙ্গে আমাদের কয়েক দিন আগেও দেখা হয়েছিল একটি দেওয়ালের কাছে এবং কফি শপের ল্যাভেটরিতে। সপ্তাহ শেষে আমরা সবজি বাগান তদারকি করে পুরো হাত-পায়ে ব্যথার রাজ্য নামাই। স্বপ্নের ভেতর আমরা ঘড়ির কাঁটা উলটে নিই। একটি ভুলভুলাইয়া পথের কোথাও নিষিদ্ধ সুঁড়িপথে চীনের প্রধানমন্ত্রী এলেন, গুন্টার গ্রাস গেলেন জেনেভা ক্যাম্পে, রুদ্রবীণা আর সরস্বতী বীণা নিয়ে তর্ক জমল—কিন্তু তাজমহল রোডের ওই লোকটি খুব সামান্যই অংশগ্রহণ করলেন। আমরা বাজি ধরি, লোকটির সঙ্গে ১৩ মার্চের পর দেখা